গুণীজন

আমাদের প্রেরণার উৎস

৭ম বর্ষ | ১৩ম সংখ্যা | জানুয়ারী ২০১৬ | www.gunijan.org.bd

সম্পাদকীয়

'গুণীজন' ২০০৩ সাল থেকে দেশের গুণী ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য ওয়েবসাইট (www.gunijan.org.bd), স্কুল কর্মসূচি, সিডি প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। নতুন প্রজন্ম তাদের দেশের সেরা সন্তানদের চিনে নিতে শিখবে–এটাও গুণীজন ট্রাস্টের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, তাঁদের অবদান, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্রের সমন্বয় করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখন অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেটাও কাজে লাগানো হচ্ছে। গুণীজন ট্রাস্টের আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে 'গুণীজন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের সংখ্যায় জয়নুল আবেদীন, আবুল হাসান, হুমায়ূন আহমেদ ও সেলিম আল দীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ জীবনী পড়ার জন্য ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সব ধরনের সহযোগিতার জন্য ডিনেটকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের এই প্রয়াস স্বার্থক হয়ে উঠবে তখনই, যখন তরুণ প্রজন্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তাতে তাদের নিজেদের চলার পথ নির্ধারণ করা সহজ হয়ে উঠবে।

জয়নুল আবেদিন

ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। আর তাইতো মাত্র ষোল বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে বন্ধুদের সাথে সেই দূরের শহর কলকাতায় গিয়েছিলেন কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস দেখার জন্য। সেখান থেকে ঘুরে আসার পর সাধারণ পড়াশুনায় মন বসাতে পারছিলেন না কোনভাবেই। তাই ১৯৩৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই স্কুলের সাধারণ পড়ালেখার পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস-এ ভর্তি হন। তাঁর মা ছেলের এই আগ্রহ দেখে নিজের গলার হার বিক্রি করে ছেলেকে কলকাতার এই আর্ট স্কুলে পড়তে যেতে সাহায্য করেছেন। আর ছেলেও মায়ের এই ঋণ শোধ করেছেন দেশের সুনামধন্য শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

দেশের সুনামধন্য ও অন্যতম এই শিল্পী হলেন জয়নুল আবেদিন। তিনি ছিলেন এদেশের আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ।

জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম তমিজউদ্দিন আহমেদ এবং মা জয়নাবুন্নেছা। বাবা ছিলেন পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর। তিনি ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মপুত্র নদের পাবন অববাহিকার অত্যন্ত শান্ত , সুনিবিড় ও রোমান্টিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর শৈশব এবং তারুণ্যের প্রধানতম অর্জন ছিল বলতে গেলে এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের অভিজ্ঞতা। তাঁর শৈল্পিক মানসিকতা নির্মাণে প্রকৃতির প্রভাব ছিল অসামান্য ও সুদূরপ্রসারী। তিনি বলতে ভালোবাসতেন, "নদীই আমার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক"।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের ড্রইং এ্যান্ড পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩৮ সালেই নিখিল ভারত চিত্র প্রদর্শনীতে গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি। এ পুরস্কার ছিল ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে আঁকা তাঁর একগুচ্ছ জলরং ছবির জন্যে। তিনি তখন ছিলেন একজন বিশ্বস্ত নিসর্গশিল্পী। কিন্তু ১৯৪৩- এর বাংলার দুর্ভিক্ষ জয়নুল আবেদিনকে একেবারে বদলে দেয়। গ্রাম-বাংলার রোমান্টিক নিসর্গ শিল্পীকে রূপান্তরিত করে ফেলে এক দুর্দান্ত বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বে।

দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পরপরই জয়নুল তাঁদের ময়মনসিংহের বাড়িতে ফিরে যান। সেখানেও দুর্ভিক্ষের যে মর্মান্তিক দৃশ্যাবলি দেখতে পান তাতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হন এবং আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত দুস্থ মানবতা যেন সে যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হয়ে আসে। তেতাল্লিশের কলকাতা মহানগরে ঘটেছে মানবতার চরম অবমাননা। ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট থেকে খাদ্যান্বেষণে তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে মানুষ আর কুকুরের মধ্যে। ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক জয়নুল এ রকম অমানবিক দৃশ্যে প্রচন্ডভাবে মর্মাহত হন, আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কিন্তু সে আবেগকে তিনি কাজে লাগান সেসব দৃশ্যাবলির শিল্পরূপ দিতে। তিনি রাতদিন শুধু কলকাতার দুর্ভিক্ষের সেসব নারকীয় দৃশ্যাবলির স্কেচ করতে থাকেন।

জয়নুল তখন আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, তাঁর আয় সামান্য। দুর্ভিক্ষের বাজারে উন্নতমানের শিল্পসামগ্রী তখন যেমন ছিল দুর্লভ তেমনি দুর্মূল্য। সে কারণে তিনি বেছে নেন শুধু কালো কালি আর তুলি। শুকনো তুলিতে কালো চীনা কালির টানে স্কেচ করতে থাকেন অতি সাধারণ সস্তা কাগজের ওপর। ব্যবহার করেছেন কার্টিজ পেপার। এসব কাগজ ছিল ঈষৎপীত বর্ণের। এমনকি তিনি প্যাকেজিং কাগজও ব্যবহার করেছেন। সাধারণ স্বল্পমূল্যের এসব অঙ্কন সামগ্রী ব্যবহার করে তিনি যে শিল্প সৃষ্টি করলেন তাই পরিণত হলো অমূল্য সম্পদে। এমন এক অসাধারণ শক্তিশালী অঙ্কন শৈলীর মাধ্যমে তিনি দুর্ভিক্ষের করুণ বাস্তব দৃশ্যাবলি চিত্রায়িত করলেন, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত উপমহাদেশের চিত্র ঐতিহ্যে ছিল না।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে সে বছরই কলকাতায় যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তাতে জয়নুল তাঁর দুর্ভিক্ষ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালে শেষ বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টসের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পান। ১৯৪৭ সালে জয়নুল পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে তাঁর চাকরি-টি ছেড়ে ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত নর্মাল স্কুলে আর্ট শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু তখন থেকেই তিনি এদেশে শিল্প আন্দোলন শুরুর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকাতে প্রদেশের প্রথম আর্ট স্কুল, গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট অফ আর্টস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন তিনি। তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাঁর এই উদ্যোগটি ছিল রীতিমতো বিপ্লবাত্মক ঘটনা।

তাঁর শিল্পী হিসেবে খ্যাতি, অসাধারণ সাংগঠনিক মেধা, তৎকালীন শিল্পী সহকর্মী ও বন্ধুদের সহযোগিতা এবং কতিপয় বাঙালি সরকারি কর্মকর্তার সাহায্য ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়েই সম্ভব হয়েছিল ১৯৪৮ সালে এদেশের প্রথম আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা। তখন এর নাম ছিল 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্টস'। এই ইনস্টিটিউটকে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষরূপে। মাত্র দু'কামরার সেই ইনস্টিটিউটটিকে ১৯৫৬ সালের মধ্যেই তিনি এক অতি চমৎকার আধুনিক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন। পরবর্তীকালে এটি পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। (আরো পরে মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তান্তরিত হয় এবং এর বর্তমান পরিচয় চারুকলা ইনস্টিটিউট নামে)। কলেজ ক্যাম্পাসের নকশা নির্মাণে জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি মাজহারুল ইসলামকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৫১-৫২-তে জয়নুল আবেদিন সরকারি বৃত্তি নিয়ে এক বছরের জন্যে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন চারুকলা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে তাঁর নিজের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীও করেন। তাঁর কাজ ইংল্যান্ডের বিদগ্ধজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর এই ইংল্যান্ড ভ্রমণটি তাঁর দৃষ্টি আরো প্রসারিত করে এবং সম্ভবত এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের চারুকলা চর্চা শুরু থেকেই এক প্রাণবন্ত আধুনিকতার চরিত্র গ্রহণ করতে পেরেছিল। আবেদিনের এই ইউরোপ ভ্রমণ তাঁকে বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্পের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কেও বিশেষভাবে সচেতন করে তোলে।

১৯৫২ সালে বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি এদেশের স্থানীয় শিল্প-ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্প-আন্দোলন ও কৌশলাদির সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। তিনি তখন থেকেই চিত্রকলায় এক ধরনের আধুনিক বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তোলার পক্ষে সুস্পষ্ট ও জোরালো মত ব্যক্ত করতে থাকেন। তাঁর এই মানসিকতা তাঁর নিজের কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে এবং এর অব্যবহিত পরে আঁকা তাঁর ছবিতে একটি অসাধারণ আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আঙ্গিকের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায়, জয়নুল গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ প্রাত্যহিক অথচ অত্যন্ত প্রতীকী গুরুত্বসম্পন্ন দৃশ্যাবলি এঁকেছেন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার সেই তুলির বলিষ্ঠতা ও সাবলীলতা আবার প্রাণ পেয়েছে এ সময়ের কাজে। অধিকাংশ কাজ জলরঙ বা সোয়াশে করা। ব্যবহৃত জলরঙের বৈশিষ্ট্য হালকা এবং অনুজ্জ্বল, তুলির টান এবং কম্পোজিশন বা স্পেস ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচ্যধর্মী। অন্যদিকে বিষয় উপস্থাপনা ও ড্রইং পাশ্চাত্য-বাস্তব-ধর্মী। এভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে তাঁর শিল্পকর্মে।

তাঁর 'ঝড়' শীর্ষক ছবিটি এক অসাধারণ কাজ। এতে বাংলাদেশের কালবৈশাখীর আকস্মিকতা ও উদ্দামতা ধরা পড়েছে অতি চমৎকার-ভাবে। একইভাবে আরেকটি সুন্দর জলরঙ ছবি 'মই দেয়া'। তবে এই সিরিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্ভবত মাঝারি সাইজের একটি জলরঙ, যার শিরোনাম 'বিদ্রোহী'। পরবর্তী সময়ে এটি একটি প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি অবাধ্য গাভী ষাঁড়ের মতো প্রচন্ড শক্তিতে তার বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে। এই আঙ্গিকে তিনি ছবি এঁকেছেন সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে।

এর পরপরই '৫২-৫৩-তে জয়নুল গড়ে তোলেন এক চমৎকার নতুন ঢং। জয়নুলের এই ঢঙের কাজে বাংলার লোকশিল্পের নানা মটিভ এবং রং বিন্যাসের প্রভাব লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে কিছু স্মরণীয় কাজ হলো 'নৌকোর গুণটানা', 'পল্লী-রমণী', 'আয়না নিয়ে বধূ', 'একাকী বনে', 'পাইন্যার মা', 'মা ও শিশু', 'তিন পল্লী রমণী', 'মুখ চতুষ্টয়' ইত্যাদি।

১৯৭২ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর অন্যতম উপদেষ্টা মনোনীত হন। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াস্থ 'কংগ্রেস ফর ওয়ার্ল্ড ইউনিটি'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

জয়নুল আবেদিন ছিলেন মুক্তিকামী মানুষ। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁদের সবার সাথেই একাত্মতা জানাতে উৎসাহী ছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালে তিনি আরব লীগের আমন্ত্রণে ছুটে যান মধ্যপ্রাচ্যের সমর ক্ষেত্রে। আল-ফাতাহ গেরিলাদের সাথে যুদ্ধফ্রন্টে সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি আঁকেন, তাঁর সেসব ছবির প্রদর্শনী হয় একাধিক আরব দেশে। মুক্তিযোদ্ধারা তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

'৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের সময় রিলিফ টিমের সাথে ছুটে যান দুর্যোগা-ক্রান্ত এলাকায়। দুঃখী জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। পরে তিনি সেখানকার মর্মস্পর্শী দৃশ্যাবলির কিছু কিছু তুলে ধরেন তাঁর তুলিতে, কালিতে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জয়নুল আবেদিনকে দায়িত্ব দেন বাংলাদেশের সংবিধানটির অঙ্গসজ্জার জন্যে। তাঁকে সহযোগিতা করেন আরো কয়েকজন শিল্পী। পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক সংকট তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। তাঁর কর্মচাঞ্চল্যে কিছুটা ভাটা পড়তে থাকে। সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী জয়নুলের স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে। তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি ছুটলেন তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন 'লোক-শিল্প জাদুঘর' প্রতিষ্ঠার কাজে। জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেস্টায় নারায়ণগঞ্জের সোনার-গাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপিত হয়।

জয়নুল তাঁর নিজের ছবি সংগ্রহের জন্য ময়মন-সিংহে তাঁর অতি প্রিয় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের একটি পুরাতন ভবনে ১৯৭৫ সালে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৬ সালে জয়নুল আবেদিন ঢাকা নিবাসী তৈয়ব উদ্দিন আহমদের কন্যা জাহানারা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের তিন পুত্র।

তাঁর অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা এবং তাঁর মহৎ মানবিক গুণাবলির জন্যে তিনি দেশে ও বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, সরকার এবং জনগণের কাছ থেকে পেয়েছেন সম্মান। রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশে চারুকলার উন্নয়নে জয়নুল আবেদিন তাঁর অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি পেয়েছেন 'শিল্পাচার্য' সম্বোধনে। এ শিরোপা তাঁকে উপহার দিয়েছে তাঁরই দেশের গুণমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ জনগণ।

দীর্ঘ ছমাস ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগে ১৯৭৬ সালের ২৮ মে তিনি মাত্র ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি আঁকার কাজ অব্যাহত রাখেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে হাসপাতালে শুয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ঢঙে শেষ ছবিটি আঁকেন- দুটো মুখ। বলিষ্ঠ মোটা রেখায়, কালো কালি আর মোম ব্যবহার করে।

তথ্য ও ছবি সূত্র -
আর্ট অব বাংলাদেশ সিরিজ; জয়নুল আবেদিন, প্রকাশ-১৯৯৭-জুন। লেখক-নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

আবুল হাসান

১৯৬৫ সাল। ব্রজমোহন কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আবুল হাসান। পরীক্ষার হলে বসে আছেন তিনি। সেদিন তাঁর জীববিদ্যা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা। কিছুক্ষণ পর খাতা দেওয়া হল। এরপর তিনি সেই খাতায় জীববিদ্যা পরীক্ষার কোন প্রশ্নোত্তর না লিখে শুরু করলেন সুদীর্ঘ কবিতা লেখা। পরীক্ষার এক ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর একজন হল তত্ত্বাবধায়ক লক্ষ করলেন আবুল হাসান একাগ্র চিত্তে কিছু একটা ভাবছেন। তিনি কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন আবুল হাসান প্রশ্নোত্তরের পরিবর্তে লিখছেন কবিতা। তখন তিনি হাসানকে কবিতা না লিখে পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর লিখতে উপদেশ দিলেন। তারপর বাকী দু'ঘন্টায় আবুল হাসান প্রশ্নোত্তর লিখে হল থেকে বের হলেন। ফলাফল বের হওয়ার পর দেখা গেল তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন।

এই ঘটনাটি তখন তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং শিক্ষকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবি আবুল হাসান ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নির্মাণ করেন একটি স্বকীয় কাব্য-ভুবন এবং এদেশের শীর্ষ কবিদের তালিকায় তাঁর নাম উঠে আসে।

১৯৪৭ সালের ৪ আগস্ট তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত টুঙ্গীপাড়া থানার বর্ণি গ্রামে নানার বাড়িতে কবি আবুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন। 'দাড়িয়া' বংশোদ্ভূত আবুল হাসানের প্রকৃত নাম আবুল হোসেন মিয়া, আর ডাকনাম ছিল 'টুক'। তাঁর বাবার নাম মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, মা মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম। তাঁর বাবা প্রথমে ভারতীয় পুলিশ বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে তিনি কলকাতা থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন এবং তৎকালীন বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার নাজিরপুর থানাধীন ঝনঝনিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কলকাতা থেকে এসে মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ঢাকা সদর থানায় পুলিশ বিভাগের চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে ২২ মে মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করা সালেহা বেগম ছোটবেলা থেকে গল্প-উপন্যাস পড়তেন। তাঁরা সাত ভাই-বোন। আবুল হাসান ছিলেন বাবা-মার প্রথম সন্তান।

আবুল হাসানের বাবার বদলীর চাকরি হওয়ায় তাঁর মা অধিকাংশ সময় আবুল হাসানের নানার বাড়িতে থাকতেন। সেকারণে আবুল হাসানের শৈশব কেটেছে নানার বাড়ি বর্ণি গ্রামে। শৈশবে আবুল হাসান বড় হয়ে উঠেছেন নানা মোহাম্মদ আবদুল গফুর মোলার আদর-যত্নে। নানার কাছ থেকে তিনি গল্প ও ছড়া শুনতেন, তাঁর হাত ধরেই বাড়ির চারপাশ পেরিয়ে তিনি পথে নেমেছেন, দেখেছেন বর্ণি গ্রামের অনাবিল প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র। নানার বাড়ির পরিবেশটি ছিল সাহিত্য চর্চার অনুকূল। শৈশবে আবুল হাসান তাঁর উচ্চ শিক্ষিত তিন মামার কাছ থেকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা থেকেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। শৈশবের বর্ণি গ্রাম তাঁর মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা এবং গল্পে যে সংগ্রামশীল গ্রামীণ মানুষের প্রতিরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার প্রাথমিক প্রেরণার উৎস এই বর্ণি গ্রাম আর তার সংগ্রামী জনগোষ্ঠী।

নানা মোহাম্মদ আবদুল গফুর মোল্লার তত্ত্বাবধানে শুরু হয় আবুল হাসানের শিক্ষাজীবন। ১৯৫৩ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন মামাবাড়ির নিকটবর্তী বর্ণি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শৈশব থেকেই আবুল হাসান ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল খুব প্রখর। প্রতি ক্লাসেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। বর্ণি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আবুল হাসানের সাহিত্য-জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন তিনি প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন। স্কুলের বার্ষিক বিচিত্রানুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে আবুল হাসান সকলকে বিস্মিত করে দেন। মার্জিত রুচি ও শান্ত-স্বভাবের হাসানকে স্কুলের শিক্ষকরা খুব স্নেহ করতেন।

অষ্টম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হবার পর আবুল হাসান পড়ালেখার উদ্দেশ্যে মামাবাড়ির অবারিত প্রশ্রয় ও মধুর পরিবেশ ছেড়ে চলে আসেন পিতার কর্মস্থল ঢাকায়। এখানে এসে তিনি আরমানিটোলা সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আরমানিটোলা স্কুলে পড়ালেখার সময় থেকেই আবুল হাসান নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং ক্লাসের বইয়ের চেয়ে ক্লাসের বাইরের বই পড়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন বেশি। আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে আবুল হাসান দ্বিতীয় বিভাগে এস.এস.সি. পাস করেন।

এস.এস.সি. পাশ করার পর আবুল হাসান ১৯৬৩ সালে বরিশালের ব্রজমোহন সরকারী মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি হন। বরিশালে এসে কবি হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয় থেকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। কলেজ বার্ষিকীতেও তাঁর কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।

এইচ.এস.সি. পাশ করার পর ১৯৬৫ সালে আবুল হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই হাসান সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি ঢাকার তরুণ কবিদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন এবং আস্তে আস্তে পদার্পণ করেন 'উদ্বাস্তু -উন্মুল' যৌবনে। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে হাসানের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দেয়ার কথা। সময়মত তিনি পরীক্ষার ফিস জমা দিতে পারেননি, ফলে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। তারপর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর অগ্রসর হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেলে আবুল হাসান অর্থের প্রয়োজনে পত্রিকায় চাকরি নেয়ার কথা ভাবেন। ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে তিনি দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় বার্তা বিভাগে চাকরি নেন। কিন্তু মাত্র তিন মাস পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। কোন পত্রিকাতেই তিনি একটানা বেশী দিন চাকরি করেননি।

১৯৭২ সালের প্রথম দিকে আবুল হাসান 'গণবাংলা' পত্রিকায় চাকরিতে যোগ দেন। 'গণবাংলা'-য় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক শহীদ কাদরীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন তিনি। 'গণবাংলা' পত্রিকায় হাসান প্রায় এক বছর চাকরি করেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত গণবাংলা'-য় তিনি কর্মরত ছিলেন। তারপর তিনি যোগ দেন আবদুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক 'জনপদ' পত্রিকায়। 'জনপদ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি। এ পত্রিকায় প্রথম দিন থেকেই আবুল হাসান সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। 'জনপদ' পত্রিকায় তিনি ১৯৭৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত চাকরি করেন। এই দেড় বছরে 'জনপদ' পত্রিকায় আবুল হাসানের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে-এর মধ্যে আছে কবিতা, প্রবন্ধ এবং উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এই পত্রিকায় তিনি 'আপন ছায়া' এবং 'খোলাশব্দে কেনাকাটা' শীর্ষক দুটি উপ-সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। 'খোলাশব্দে কেনাকাটা' শীর্ষক কলামটির প্রথম চার সংখ্যা তিনি 'ভ্রামণিক' ছদ্মনামে লিখেছেন। ১৯৭৪ সালের জুন মাসের শেষের দিকে আবুল হাসান 'জনপদ' পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে সহ-সম্পাদক হিসেবে দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় যোগ দেন। কবি আল মাহমুদ সম্পাদিত 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় আবুল হাসান ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় তিনি 'আড়ালে অন্তরালে' এবং 'বৈরী বর্তমান' শীর্ষক দুটি উপ-সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। এছাড়া 'ফসলবিলাসী হাওয়ার জন্য কিছু ধান চাই' শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করে সেইসময় তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে আবুল হাসান যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তেন তখন থেকে ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি কবিতা লিখতেন আবুল হোসেন নামে। কিন্তু আবুল হোসেন নামে অগ্রজ একজন কবি থাকার কারণে নাম-বিভ্রাট এড়ানোর জন্যে কবি রফিক আজাদের উপদেশে তিনি নামটা কিঞ্চিত পরিবর্তন করে হয়ে ওঠেন আবুল হাসান।

১৯৭০ সালটি আবুল হাসানের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যবহ। কারণ 'শিকারী লোকটা' শিরোনামে একটি কবিতার জন্য এ সময় তিনি সমগ্র এশিয়াভিত্তিক এক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। পরে ওই কবিতাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সমগ্র পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের কবিতা-সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭০) শীর্ষক ওই গ্রন্থে তদানীন্তন পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি আবুল হাসানের কবিতা স্থান পায়। আবুল হাসানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাজা যায় রাজা আসে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। 'রাজা যায় রাজা আসে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আবুল হাসানের কবিখ্যাতি বিস্তার লাভ করে। এরপর অসুস্থতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামী আবুল হাসানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে। 'যে তুমি হরণ করো' শীর্ষক দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশ করে ঢাকার প্রগতি প্রকাশনী। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আবুল হাসান তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক'-এর পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে প্রুফ দেখা সবটাই করেছেন। সন্ধানী প্রকাশনী থেকে 'পৃথক পালঙ্ক' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর ১৯৮৫ সালে নওরোজ সাহিত্য সংসদ প্রকাশ করে 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা'।

মূলত কবি হলেও আবুল হাসান বেশ কিছু সার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ঢাকায় বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকপত্রে তাঁর গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। তবে জীবিত অবস্থায় তাঁর কোন গল্প-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর পনের বছর পর ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর নয়টি গল্প সঙ্কলন 'আবুল হাসান গল্পসংগ্রহ'। কবিতা-গল্প ছাড়া আবুল হাসান প্রবন্ধ এবং নাটকও রচনা করেছেন। 'ওরা কয়েকজন' শীর্ষক একটি কাব্যনাটক তাঁর মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'-য় (১২.১২.১৯৭৫) প্রকাশিত হয়, যা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৯৮৮ সালে।

জার্মানী থেকে ফিরে এসে আবুল হাসান 'কুব্জরধাম' নামে একটি বৃহৎ কাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন। এর বেশ কিছু অংশ তিনি রচনাও করেছিলেন।

অসুস্থ তার কারণে তিনি তা আর শেষ করতে পারেননি আবুল হাসান সেকালের স্বভাব-কবির মতো অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একটি তরতাজা কবিতা লিখে দেয়ার মতো বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শৈশব থেকেই আবুল হাসান রিউম্যাটিক জ্বরে ভুগেছেন। কখনো সুচিকিৎসা হয়নি বলে যৌবনে পদার্পণের পূর্বেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর হৃদপিন্ড সম্প্রসারণজনিত ব্যাধি প্রথম ধরা পড়ে ১৯৭০ সালে। ওই সময় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু হাসপাতাল থেকে মুক্তিলাভের পর অনিয়মিত খাওয়া, অমানুষিক পরিশ্রম এবং রাত জাগার অভ্যাস আবুল হাসানকে দ্রুত হৃদরোগে জর্জরিত করে তোলে। দিন দিন তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি পুনরায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করে শারীরিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। ১৯৭৪ সালে কয়েকজন বন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে তাঁকে চিকিৎসার জন্য পূর্ব জার্মানী পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশ এবং জার্মানীর মধ্যে সম্পাদিত সাংস্কৃতিক চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ব জার্মান সরকারের অর্থানুকূল্যে আবুল হাসানকে খুব দ্রুত পূর্ব জার্মানী পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বার্লিনে বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাভেয়ার্স এম. আনোয়ার হাশিমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আবুল হাসানকে বার্লিনস্থ চ্যারিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আবুল হাসান খানিকটা সুস্থ হয়ে হয়ে ওঠেন এবং হাসপাতালের বেডে শুয়েই তিনি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেন। কখনো কখনো তিনি হাসপাতালের অদূরে গ্রীষ্মনিবাসে বেড়াতেও যেতেন।এ সময় শিল্পী গ্যাব্রিয়েলা ও আরো একজন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবুল হাসান ওই চিত্রশিল্পীর স্টুডিওতেও মাঝে মাঝে যেতেন এবং এভাবে চিত্রশিল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বার্লিন থেকে ফিরে আসার পর আবুল হাসান অনেকগুলো স্কেচ এঁকেছেন- হতে পারে, এটা জার্মান চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ফসল।

১৯৭৫ সালের শুরুতে আবুল হাসান পুনরায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। জার্মান ডাক্তাররা তাদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে তাঁকে চেকো-স্লাভাকিয়ায় চিকিৎসার জন্য পাঠানোর উদ্যোগ নেয় কিন্তু তাঁর হৃৎপিন্ড ততদিনে প্রায়-অকেজো হয়ে গেছে, যা সারিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন জটিল অস্ত্রোপচার। জটিল অস্ত্রোপাচারের প্রয়োজনীয় সুবিধা না থাকার জন্য কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের চিকিৎসকই অপারেশনের ঝুঁকি নিতে চাননি। এই জটিল পরিস্থিতিতে বার্লিনস্থ চ্যারিটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ আবুল হাসানকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা পৌঁছেন।

ঢাকা পৌঁছে আবুল হাসান চাকরির চেষ্টা করতে থাকেন। অনেকেই তাঁকে আশ্বাস দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাসানের অসুস্থতার কথা বিবেচনা করেই কেউ তাঁকে চাকরি দেননি। পরিশ্রম জনিত ক্লান্তিতে তাঁর অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পাবে- এই ছিল তাঁদের ধারণা। একদিকে অসুস্থতা, অন্যদিকে বেকার জীবন, মাথার ওপর ভাই-বোনদের পড়ালেখার খরচ যোগানোর দায়িত্ব- সব কিছু মিলিয়ে আবুল হাসান তখন এক অস্থির জীবন যাপন করেছেন। ক্রমে তিনি পুনরায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর। হাসপতালের বেডে শুয়ে বুকের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি লিখেছেন বেশ কিছু কবিতা।

অবশেষে ২৬ নভেম্বর মাত্র আটাশ বছর বয়সে আবুল হাসান মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পর তিনি ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৮২ সালে একুশে পদক লাভ করেন। স্বল্পপরিসর জীবনে মাত্র দশ বছরের সাহিত্য-সাধনায় আবুল হাসান নির্মাণ করেছেন এক ঐশ্বর্যময় সৃষ্টিসম্ভার, যার ভিতর দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন যুগ যুগ ধরে।

তথ্যসূত্র: আবুল হাসান, লেখক- বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রকাশনী: বাংলা একাডেমী (জীবনী গ্রন্থমালা), প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

লেখক : মৌরী তানিয়া

হুমায়ূন আহমেদ

সিলেটের মীরা বাজার। ১৯৫০-৫৫ সালের দিকের শহর। গাছপালা শোভিত, প্রাচীন আমলের ঘর দোর, ভাঙা রাস্তা কোথাও কোথাও কাঁচা বাড়ি। আবার মাঝে মাঝে খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো বনেদি বাড়ি। স্কুল ছুটির পর এমনি এক রাস্তা ধরে হেঁটে চলছে এক বালক। দুরন্ত ঘাস ফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর চলা। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই, যেন কোন একদিকে গেলেই হল। ইচ্ছে হল আর হুট করে ঢুকে পড়ল কোন বাড়িতে। কোন কোন বাড়ি থেকে অনাহুত ভেবে বের করে দেয় আবার কোন কোন বাড়িতে একটা ছোট্ট দেব শিশু ভেবে আদর আপ্যায়নও করে। এমনিভাবে হাঁটতে হাঁটতে সামনে পড়ে গাছগাছালিতে ছাওয়া এক বিশাল ঘেরা জায়গা, সেখানে ধবধবে সাদা রঙের বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়ি। সিলেট এম. সি. কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এস কে রায় চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। বালকের কাছে অধ্যাপকের পরিচয় হচ্ছে প্রফেসর সাব, অতি জ্ঞানী লোক - যাঁকে দূর থেকে দেখলেই পূণ্য হয়। তো সেদিন দুপুরে সেই প্রফেসর সাবের বাড়ির গেট খোলা পেয়ে হুট করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বালক।

গাছপালার কী শান্ত শান্ত ভাব। মনে হচ্ছে সে যেন ভুল করে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি কোন বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছে। একা একা অনেকক্ষণ সে হাঁটল। হঠাৎ দেখতে পেল কোনার দিকের একটি গাছের নিচে পাটি পেতে ষোল সতের বছরের একটি মেয়ে উপুর হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতে একটা বই। সে বই পড়ছে না- তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। বালকের মনে হল এত সুন্দর মেয়ে সে আর দেখেনি। মনে হচ্ছে মেয়েটির শরীর সাদা মোমের তৈরি। মেয়েটি হাত ইশারায় তাঁকে ডাকল। কাছে যেতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, কী নাম তোমার খোকা? কাজল, বালকের উত্তর।

এই সেই কাজল যিনি বড় হয়ে বাংলা কথা সাহিত্যে এক স্বপ্নলোকের রচনা করেছিলেন। আর এই স্বপ্নলোকের চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রফেসর সাহেবের এই মেয়ে শুক্লা। সেই চাবিটির নাম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'।

কাজল। সিলেট থানার ওসি ফয়জুর রহমান সাহেবের বড় ছেলে। থানার দারোগা পুলিশ সাধারণত যেমন হয়, এই একটু খিটিমিটি স্বভাব, একটু আধটু ঘুষ, জনতা দেখে অযথাই ধমক দেওয়া তেমন নন এই ওসি সাহেব। বিপরীতে কবিতার প্রতি ঝোঁক, গানের প্রতি দরদ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর কিছুটা বিচিত্র খেয়াল নিয়ে এই ওসি সাহেবের জীবন। ইনি পূর্ণিমার রাতে শিশুদের আকাশ দেখাতে ভালোবাসেন। রাত দুপুরে স্ত্রীর বায়না মেটাতে দু'জনে মিলে নেমে যান পুকুরে। মাসিক বেতন নব্বুই টাকা যার একটা অংশ পাঠিয়ে দেন গ্রামের বাড়িতে, এক অংশ দিয়ে প্রতি মাসে বই কেনেন, আর বাকী যা থাকে তা তুলে দেন স্ত্রীর হাতে, আর তিনি থাকেন সারা মাস নিশ্চিন্ত । একবার এক মাসের প্রথম তারিখে খুব হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন ফয়জুর রহমান। বিশ্বজয় করা এক হাসি দিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'আয়েশা একটা বেহালা কিনে ফেললাম।' স্ত্রী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী কিনে ফেললে?' বেহালা। বেহালা কী জন্য? বেহালা বাজানো। শিখব কত দাম পড়ল? দাম সস্তা, সত্তর টাকা। সেকেন্ড হ্যান্ড বলে এই দামে পাওয়া গেল। ফয়জুর রহমান সংসার চালাবার জন্য স্ত্রীর হাতে দশটি টাকা তুলে দিলেন। স্ত্রী হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। এই বিচিত্র খেয়ালি মানুষটি শেষাবধি অবশ্য বেহালা বাজানো শিখতে পারেননি। একদিন তাঁর সাধের বেহালা তাঁর শিশু সন্তানদের অধিকারে চলে গেল। তারা বেহালার বাক্স দিয়ে পুতুলের ঘর বানাল। এই খেয়ালি মানুষটিই একদিন পাহাড়ের মতো কঠিন আর অটল হয়ে গিয়েছিলেন। তখন ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বছর। তিনি তখন পিরোজপুর থানার ওসি। পাকিস্তানি হায়েনারা তাঁর সামনে এলে তিনি পাহাড়ের মতো অটল ও স্থির থেকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন মৃত্যুকে। মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায় ধনুকের ছিলার মতো বুক টান টান করে দাঁড়িয়েছিলেন হানাদারদের বেয়নেটের সামনে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার অপরাধে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে মৃতদেহ ফেলে দেয় ধলেশ্বরী নদীর পানিতে। স্থানীয় লোকজন তাঁর মৃত শরীর পানি থেকে তুলে নদীতীরেই দাফন করেন। পরবর্তীতে যুদ্ধশেষে তাঁর সন্তানেরা তাঁর দেহাবশেষ সেখান থেকে তুলে আবার কবর দেন। এই শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ সাহেবের বড় ছেলে কাজল আমাদের আজকের বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন স্রোতের নকীব হুমায়ূন আহমেদ।

পাকিস্তান জন্মের পরের বছর জন্ম নেন হুমায়ূন আহমেদ। সাল ১৯৪৮। তারিখ ১৩ নভেম্বর। জন্ম নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জের কুতুবপুর গ্রামে। বাবা ফয়জুর রহমান ও মা আয়েশা ফয়েজের প্রথম সন্তান তিনি। ফলে অত্যধিক বাড়াবাড়ি রকমের আদরের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশবের দিনগুলি পার হতে থাকে। তাঁর শৈশবের প্রথম অধ্যায়টি যতটা স্নেহ ও মমতায় কেটেছে দ্বিতীয় অধ্যায়টি কেটেছে ততটাই বঞ্চনার ভেতর দিয়ে। শৈশবে তাঁর মা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর থেকে সুস্থ হওয়ার পর তাঁর স্মৃতিবিভ্রম দেখা দেয়। তিনি কাউকেই চিনতে পারতেন না, এমন কি তাঁর ছেলেকেও না। ফলে হুমায়ূন আহমেদকে পাঠিয়ে দেয়া হয় নানার বাড়ি মোহনগঞ্জে। সেখানে দু'বছর তিনি নানা-নানির আদরে বেড়ে উঠেন। দু'বছর পর মা সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর দশ বছর বয়স পর্যন্ত হুমায়ূন আহমেদের মোহনীয় শৈশব কেটেছে। বাবার চাকরি সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিচিত্র সব দৃশ্যাবলীর ভেতর দিয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর শৈশব অতিবাহিত করেছেন।

শৈশবে হুমায়ূন আহমেদ যত জায়গায় গিয়েছেন তার মাঝে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলো দিনাজপুরের জগদ্দল। তার প্রধান কারণ ছিল তাঁরা যেখানে থাকতেন তার আশেপাশে কোন স্কুল ছিল না। স্কুলের কথা মনে হলেই হুমায়ূন আহমেদের মুখ এমন তেতো হয়ে যেত যে, মনে হত যেন তাঁর মুখে জোর করে কেউ ঢেলে দিয়েছে নিশিন্দা পাতার রস। বাবা মা তাঁকে স্কুলে পাঠাতেন বটে তবে স্কুলে সময় কাটাতেন কেবল দুষ্টুমি করে। টেনে টুনে পাশ করতেন। প্রাইমারি স্কুল পাশের পর এই হুমায়ূন বদলে যান। ষষ্ট শ্রেণীতে উঠার পর থেকে স্কুলের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। আগ্রহটা এমনি ছিল যে এস.এস.সি. পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার পর দেখা গেল তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। ১৯৬৫ সালে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে তিনি এস.এস.সি. পাস করেন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে তিনি এইচ.এস.সি. পাস করেন। এইচ.এস.সি. পরীক্ষাতেও তিনি মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন। ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে। ১৯৭২ সালে রসায়ন বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর পাশ করে তিনি একই বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রফেসর যোসেফ এডওয়ার্ড গাসের তত্ত্বাবধানে পলিমার কেমিস্ট্রিতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি নেন। ড. হুমায়ূন আহমেদ লেখালেখিতে অধিক সময় এবং চলচ্চিত্রে নিয়মিত সময় দেবার জন্য পরবর্তীতে অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে দেন।

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ হুমায়ূন আহমেদ। গত কয়েক দশক ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় 'নন্দিত নরকে' উপন্যাস দিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর আত্মপ্রকাশ। 'নন্দিত নরকে' যখন প্রকাশ হয় তখনই বোঝা গিয়েছিলো কথা সাহিত্যের কঠিন ভুবনে তিনি হারিয়ে যেতে আসেননি, থাকতেই এসেছেন। তাঁর মধ্যে এই অমিত সম্ভাবনা তখনই টের পেয়ে প্রখ্যাত লেখক সমালোচক আহমদ শরীফ এক গদ্যের মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। আহমদ শরীফের প্রশংসা যে অপাত্রে ছিল না তা তো আজ সর্বজন বিদিত। মধ্যবিত্ত জীবনের কথকতা সহজ সরল গদ্যে তুলে ধরে পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের কথকতা বয়ানেই সীমিত নয় তাঁর কৃতিত্ব, বেশ কিছু সার্থক সায়েন্স ফিকশন-এর লেখকও তিনি। জনপ্রিয় চরিত্র মিসির আলী ও হিমুর স্রষ্টা তিনি- যে দু'টি চরিত্র যথাক্রমে লজিক এবং এন্টি লজিক নিয়ে কাজ করে।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের ভিতটা গড়ে ওঠে পারিবারিক বলয় থেকেই। বাবা ছিলেন সাহিত্যের অনুরাগী। বাসায় নিয়মিত সাহিত্য আসর বসাতেন, সেই আসরের নাম ছিলো সাহিত্য বাসর। গল্প লেখার অভ্যেসও ছিল তাঁর। যদিও সেসব গল্প কোথাও ছাপা হয়নি। তবে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থের নাম 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'। তাঁর বাবা সন্তানদের মধ্যে যেন সাহিত্য বোধ জেগে ওঠে সে চেষ্টা করেছেন সবসময়। মাঝে মাঝে দেখা যেত তিনি নির্দিষ্ট একটা বিষয় দিয়ে ছেলেমেয়েদের কবিতা লিখতে বলতেন, ঘোষণা করতেন যার কবিতা সবচেয়ে ভাল হবে তাকে দেওয়া হবে পুরস্কার। হুমায়ূন আহমেদের বড় মামা শেখ ফজলুল করিম যিনি তাঁদের সাথেই থাকতেন এবং যিনি ছিলেন তাঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী, তিনি কবিতা লিখতেন, লিখতেন নাটক এবং সেই নাটক তিনি তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিদের দিয়ে বাসায় গোপনে গোপনে মঞ্চস্থ ও করাতেন। আর হুমায়ূন আহমেদের নিজের ছিল গল্প উপন্যাসের প্রতি অসাধারণ টান। তাঁর এই টান তৈরি করে দিয়েছিলেন মীরা বাজারের প্রফেসর রায় চৌধুরী সাহেবের মেয়ে শুক্লা। যিনি তাঁকে 'ক্ষীরের পুতুল' নামের বইটি উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম যেদিন তিনি ওই বাড়িতে (যে বাড়ির বর্ণনা লেখার শুরুতে দিয়েছি) যান শুক্লা তখন তাঁকে মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন। মিষ্টির লোভে দ্বিতীয় দিন আবার সেই বাড়িতে গেলে শুক্লা আবার তাঁকে মিষ্টি খেতে দেন। তৃতীয় দিন তিনি তাঁর ছোট বোন শেফালিকে নিয়ে যান। শুক্লাদের বাড়িতে তখন মিষ্টি ছিল না। শুক্লা তখন মিষ্টির পরিবর্তে তাঁদের হাতে তুলে দেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' বইটি।

'ক্ষীরের পুতুল' হলো হুমায়ূন আহমেদের পড়া প্রথম সাহিত্য। যদিও তার বাবার বিশাল লাইব্রেরি ছিলো। কিন্তু সমস্ত বই তিনি তালাবদ্ধ করে রাখতেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন তাঁর বাচ্চাদের এসব বই পড়ার সময় এখনো হয়নি। কিন্তু 'ক্ষীরের পুতুল' পড়ার পর তিনি তাঁর বাবার বইয়ের আলমারী থেকে বই চুরি করে লুকিয়ে পড়তে শুরু করলেন এবং একদিন বাবার হাতে ধরা পড়ে গেলেন। বাবা তাঁকে নিয়ে গেলেন সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ সেখানে। যেদিকে চোখ যায় শুধু বই আর বই। বাবা তাঁকে লাইব্রেরির সদস্য করে দিলেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন এই লাইব্রেরির সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য। এইভাবে হুমায়ূন আহমদের সাহিত্যের প্রতি জন্ম নেয় গভীর ভালোবাসা।

যদিও তাঁর প্রথম রচনা 'নন্দিত নরকে', তবে তারও বহু পূর্বে তিনি একটি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। দিনাজপুরের জগদ্দলে থাকা অবস্থায়। জগদ্দলের যে জমিদার বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। সেখানে জমিদারের পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় ছিল একটি কুকুর। জমিদারের অনেকগুলি কুকুর ছিল। তিনি সবকটি কুকুরকে নিয়ে যেতে চাইলেও এই কুকুরটি যায়নি। রয়ে গিয়েছিল বাড়ির মায়ায় আটকা পড়ে। কুকুরটির নাম ছিলো বেঙ্গল টাইগার। তাঁরা যেখানেই যেতেন কুকুরটি সাথে সাথে যেত। কুকুরটির সাথে তাঁদের একরকম বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। একদিন ভোরবেলা হুমায়ূন আহমেদ জমিদার বাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে আছেন তাঁর সাথে আছে ছোট বোন শেফালি ও ছোট ভাই জাফর ইকবাল। কিছুক্ষণ পর তাঁর মা তাঁদের সবার ছোট ভাই আহসান হাবীবকে বসিয়ে রেখে গেলেন, আর তাঁদের উপর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন তাঁকে দেখে রাখার জন্য। মা চলে যাওয়ার পর দেখতে পেলেন একটা প্রকান্ড কেউটে দরজার ফাঁক থেকে বের হয়ে এসেছে। ফণা তুলে হিস হিস শব্দে সে আহসান হাবীবের দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক তখুনি বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ে সাপটির ফলা কামড়ে ছিড়ে ফেলে। সাপও তার মরণ ছোবল বসিয়ে দিয়ে যায় কুকুরের গায়ে। দু'দিন পর যখন বিষক্রিয়ায় কুকুরের শরীর পচে গলে যেতে থাকে তখন তাঁদের বাবা মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য কুকুরটিকে গুলি করে মেরে ফেলেন। এই ঘটনা হুমায়ূন আহমেদের মনে গভীর দাগ কাটে। এই কুকুরকে নিয়েই তিনি প্রথম কিছু লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল টাইগার' (অথবা 'আমাদের বেঙ্গল টাইগার')। তারপর ১৯৭২ সালে 'নন্দিত নরকে' রচনা করেন। তারপর তো সবই ইতিহাস। একে একে 'শঙ্খনীল কারাগার', 'রজনী', 'গৌরিপুর জংশন', ' অয়োময়', 'দূরে কোথাও', 'ফেরা', 'কোথাও কেউ নেই', 'আমার আছে জল', 'অচিনপুর', 'এইসব দিনরাত্রি'সহ দুই শতাধিক উপন্যাসের জনক হুমায়ূন আহমেদ।

পেশাগত জীবনে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের মাঝে তিনি ছিলেন তুমুল জনপ্রিয়। কেবল অধ্যাপনা আর কথাসাহিত্যই নয়, তিনি যখন অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিলেন সেখানেও সাফল্যদেবী তাঁর মুঠোয় ধরা দিয়েছে। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমনি'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটি মাসের পর মাস ধরে বক্স অফিস দখল করে রেখেছিল। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে আটটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্রপুরস্কার জিতে নিয়েছিল এই ছবিটি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া' বিদেশী ভাষার ছবি ক্যাটাগরিতে অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। তাঁর অন্য কীর্তি 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'দুই দুয়ারী', 'চন্দ্রকথা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলি কেবল সুধীজনের প্রশংসাই পায়নি, মধ্যবিত্ত দর্শকদেরও হলমুখী করেছে বহুদিন পর। টিভি নাট্যকার হিসেবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। তাঁর প্রথম টিভি নাটক 'এইসব দিনরাত্রি' মধ্য আশির দশকে তাঁকে এনে দিয়েছিল তুমুল জনপ্রিয়তা। তাঁর হাসির নাটক 'বহুব্রীহি' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'অয়োময়' বাংলা টিভি নাটকের ইতিহাসে একটি অনন্য সংযোজন। নাগরিক ধারাবাহিক 'কোথাও কেউ নেই'-এর চরিত্র বাকের ভাই বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছিল টিভি দর্শকদের কাছে। নাটকের শেষে বাকের ভাইয়ের ফাঁসির রায় হলে ঢাকার রাজপথে বাকের ভাইয়ের মুক্তির দাবীতে মিছিল হয়েছিলো। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমনটি আর হয়নি কখনো। এছাড়াও অসংখ্য বিটিভি ও প্যাকেজ নাটকের নির্মাতা তিনি। নাট্যকার- নির্দেশক দুই ভূমিকায়ই সমান সফল। সফল শিল্পের আরেকটি শাখা চিত্রকলাতেও।

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৭৩ সালে গুলতেকিনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হুমায়ূন এবং গুলতেকিন দম্পতির চার ছেলে-মেয়ে। দীর্ঘ ৩২ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটিয়ে ২০০৫ সালে ডিভোর্সের মাধ্যমে তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর তিনি অভিনেত্রী ও পরিচালক মেহের আফরোজ শাওনকে বিয়ে করেন। শাওন ১৯৯০ সাল থেকে টিভিতে অভিনয় শুরু করেন। পরবর্তীতে চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত হন। তাঁদের দুই পুত্র।

হুমায়ূন আহমেদ ২০১২ সালের ১৯ জুলাই দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগে মারা যান।

তিনি একুশে পদক (১৯৯৪), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮১), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূধন দত্ত পুরস্কার (১৯৮৭), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩ ও ১৯৯৪), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮) সহ আরো অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও হয়েছেন মূল্যায়িত। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনের মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

লেখক : এহসান হাবীব

সেলিম আল দীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ক্লাসরুম। ক্লাস শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। ছাত্রছাত্রীরা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে। কারণ ক্লাস নেবেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ক্লাস শুরু হল। একেবারে পিনপতন নীরবতা। শুরুতে কয়েকজনকে ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন করলেন তিনি, বেশির ভাগই তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা তো কোন লেখাপড়া করনি, কোনকিছু জান না।' কথাটা একটি তরুণের মনে খুব লেগেছিল, নিজেকে সামলাতে পারলেন না তিনি। শেষে বলেই ফেললেন, 'আমি স্কুল-কলেজে থাকতে যা পড়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা পড়েছেন কিনা সন্দেহ।'

তরুণটির কথাটার পিছনে জোর ছিল। প্রমাণও ছিল। লিখেছিলেন 'আমেরিকান নিগ্রো সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ, অনুবাদ করেছিলেন বিভিন্ন ভাষার গল্প। তিনি আহমদ শরীফকে সেদিনই জানালেন, তিনি নাটক লেখেন, পরদিন রাতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাঁর লেখা একটি নাটক প্রচারিত হবে। তাঁর বিশ্বাস, এরকম নাটক এর আগে খুব একটা হয়নি। কথাটি বলেই তাঁর মনে হল, সর্বনাশ! কার সামনে কী বললেন তিনি। এখন পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন।

পরের দিন বন্ধুরা তাঁকে বললেন, 'শরীফ স্যার তোকে খুঁজছেন। এখনই দেখা করে আয়।' শুনে আমর্ম কেঁপে উঠেছিলেন তরুণটি। কাঁপা কাঁপা বুকে অধ্যাপক আহমদ শরীফের কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন তিনি। ভেতরে কাজ করছিলেন অধ্যাপক শরীফ, সালাম শুনে মাথাটা একটু তুলে বললেন, 'তোমার নাটক দেখলাম। তোমার অহংকার স্বার্থক।' বলে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন। তরুণটি এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটতে শুরু করলেন। সেদিনের সেই তরুণটি হলেন বাংলাদেশের অন্যতম নাট্যকার সেলিম আল দীন, যাঁকে নিয়ে এদেশের মানুষ অহংকার করে।

একেবারে অল্প বয়স থেকেই তাঁর দুরন্তপনা ছিল চোখে পড়ার মত। প্রচন্ড দুরন্তপনার পাশাপাশি চলত তাঁর পড়ালেখাও। কলাগাছের খোল কেটে, খেজুর গাছের কাঁটা সাজিয়ে বিচিত্র সব ভয় দেখানো জিনিসপত্র তৈরি করতেন তিনি। কিন্তু বেশিদিন আর গ্রামে থাকা হয় না তাঁর। সেনেরখিল গ্রামের পাঠ চুকিয়ে বাবার সঙ্গে কখনও যেতে হয় চট্টগ্রামে, কখনও সিলেট, কখনও আখাউড়া, কখনও রংপুরে।

তারপর ছেলেটি আবার ফিরে যান নিজ গ্রামে। সেখানে মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭ম থেকে ৯ম শ্রেণীতে থাকার সময়ই পড়া হয়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের গুরুত্বপূর্ণ অনেক রচনা। কৈশোরেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়ে বিস্মিত, রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়ে আলোড়িত হন ছেলেটি। একই সঙ্গে পড়া হয়ে যায় বাংলা কবিতার কেন্দ্রে, প্রান্তে থাকা বিভিন্ন কবিদের রচনা। এভাবে একটু একটু করে তৈরি হতে থাকে একজন শিল্পীর সৃজনশীল মন। কলেজে ওঠার সময়টায় তিনি বুঝতে পারেন কবিতা তাঁকে ডাকছে। ছোটবেলা থেকে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে বিমুগ্ধ তরুণটি কবিতার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেন প্রথমে। কিন্তু কিছুতেই কবিতার ভাষাটি আয়ত্তে আসছিল না তাঁর। এই বেদনা তাঁকে তাড়িয়ে ফেরে।

সেই দিকটি চিনিয়ে দিয়ে একদিন আহসান হাবীব ওই তরুণকে বললেন, 'তুমি নাটক লেখো।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তির পর একদিন ক্লাসে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কারা কবিতা লেখ?' কয়েকজন মহা-উৎসাহে দাঁড়ালে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তাঁদের বললেন, 'তোমরা বেরিয়ে যাও।'

সবাই অবাক। কিন্তু মুনীর স্যারের কথা, টু শব্দ না করে সবাই মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে না বাড়াতেই তিনি তাঁদের বললেন, 'বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের মতো কবি এসেছেন, আরও কত কবি আছে বিশ্বসাহিত্যে, কবির কোনো শেষ নেই, শেষ নেই কবিতারও। তোমাদের মধ্যে কে জোর দিয়ে বলতে পারবে যে সে জীবনানন্দ দাশের চেয়ে ভাল কবিতা লিখতে পারবে? যদি না পার তাহলে কেন কবিতা লেখা?' কিন্তু সেদিন মুনীর স্যারের কথার উত্তর না দিয়ে সবাই চুপ করে রইল। তখন তিনি বললেন, 'তবে যারা নাটক লিখতে চাও তারা থাকতে পার।' এটা ছিল কবি হতে চাওয়া একটি তরুণের জীবনের দ্বিতীয় ধাক্কা। তাহলে কি নাটকই তাঁর জীবনের নিয়তি? আহসান হাবীব বললেন, মুনীর চৌধুরী তাগাদা দিলেন আর বিষয়টা চূড়ান্ত করলেন আহমদ শরীফ। শুরু হল নিয়মিত নাটক লেখা। সেই যে শুরু আর তার শেষ হল ২০০৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী। যেদিন ঢাকায় ল্যাব এইড হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মারা গেলেন তিনি। সারা দেশের নাট্যপ্রিয় মানুষকে, অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী আর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিলেন বাংলা নাটকের অবিসংবাদিত পুরুষ সেলিম আল দীন।

জন্মেছিলেন ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট ফেনীর সোনারগাজী থানার সেনেরখিল গ্রামে। মফিজউদ্দিন আহমেদ ও ফিরোজা খাতুনের তৃতীয় সন্তান তিনি। লেখাপড়ার শুরু হয়েছিল আখাউড়ায় গৃহশিক্ষকের কাছে। এর কিছুদিন পর সেনেরখিল প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। মৌলভীবাজার বড়লেখার সিংহগ্রাম হাইস্কুল, কুড়িগ্রামের উলিপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রাইমারী স্কুল এবং রংপুর ও লালমনিরহাটের স্কুলে পড়ে নিজ গ্রাম সেনেরখিলের মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৬৪ সালে। ফেনী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন ১৯৬৬ সালে। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন। টাঙ্গাইলের সাদত কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

আহসান হাবীব, মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ তাঁর শিল্পের পথকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন এবং করোটিয়ায় পেয়েছিলেন কবি রফিক আজাদের সাহচর্য, যা তাঁর শিল্পযাত্রাকে আরো বেগবান করেছিল। এ যাত্রার মাধ্যম ছিল নাটক। ঝুঁকেছিলেন পাশ্চাত্য নাটকের তৎকালীন বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান নাট্যকারের দিকে। তাঁদের মধ্যে এডওয়ার্ড এলবি যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন আয়োনস্কোসহ আরো কিছু নাট্যকার।

অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাকেই সেলিম আল দীনের চূড়ান্ত ধারা মনে হয়েছিল কিছুদিন। কিন্তু খটকাও ছিল। যে জীবন তিনি দেখেন, যে জীবন তিনি অনুভব করেন ও কল্পনা করেন, অ্যাবসার্ড নাটকের ধারায় তা খুব খাপছাড়া লাগে তাঁর কাছে। অসংলগ্ন বোধ হয়। এই চিন্তার পাশাপাশি চলছিল রেডিও-টিভিতে নাটক লেখা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলে পেয়ে গেলেন ম. হামিদ, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর মতো সতীর্থদের। তাঁর লেখা 'জভিস ও বিবিধ বেলুন' নাটকটির নির্দেশনা দিলেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু। সেই থেকে শুরু হল সেলিম আল দীন ও নাসিরউদ্দিন বাচ্চুর নাট্যাভিযান।

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশ, মানুষ ও মাটি নিয়ে সেলিম আল দীনের পূর্বেকার ভাবনাগুলোতে ভাঙচুর ঘটে। গণহত্যা আর পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নতুন এক আত্মপ্রত্যয় আবিষ্কার করেন। লেখার ভিতর দিয়ে এদেশের মাটির দাবিকে বুঝতে পারেন তিনি। বুঝতে পারেন, মানুষের দাবিকে তুলে আনতে পাশ্চাত্যের নাট্যাঙ্গিক নয়, নিজস্ব আঙ্গিক ও মাত্রা প্রয়োজন। ততদিনে লেখা হয়ে গেছে 'সর্প বিষয়ক গল্প', 'আতর আলির নীলাভ পাট', 'সংবাদ কার্টুন', 'মুনতাসির ফ্যান্টাসি'র মতো নাটকগুলো। এদিকে জীবিকার কথাও ভাবতে হচ্ছে। তাই কপি রাইটার পদে বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'বিটপী'তে কাজ শুরু করলেন।

একদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন চোখে পড়ল ছেঁড়া একটা কাগজে। হাতে বেশি সময় ছিল না। বিষয়টি নিয়ে তিনি আলাপ করলেন পারুলের সঙ্গে। কারণ পারুলকে তিনি জীবন-সঙ্গিনী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পারুলকে বেছে নেওয়ার কারণ, তিনি হবেন লেখক। দরকার ধীর-স্থির ও কষ্টসহিষ্ণু একটি মেয়ে। যাঁর চাহিদা থাকবে কম; প্রেরণা থাকবে বেশি। পারুলের ভেতর সেই মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। পারুলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে কেমন হবে?' পারুল সানন্দে সায় দেন। ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদানের কিছুদিন পরেই বিয়ে হয় দুজনের।

প্রথাগত শিক্ষকের মতো শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই পাঠদান, পরীক্ষা, খাতা দেখা, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না তিনি। ক্লাসের বাইরেও তাঁর সৃজনশীল কাজের অংশীদার করে তুলতেন শিক্ষার্থীদের। তাদেরকে মানবসভ্যতার নানান বিন্দুকে চিনিয়ে দিতেন তিনি। তাদের হাতে তুলে দিতেন যার যার নিজস্ব শিল্পগৃহ খোলার চাবিকাঠি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর তিনি ১৯৮৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ।

১৯৭৩ সালে ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর নাটক লেখার ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কীভাবে মাটি ও মানুষের নান্দনিক দাবিকে পূরণ করা যায়-অবিরাম সে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন সেলিম আল দীন। গবেষক হিসেবে খুঁজে বের করলেন বাংলা নাটকের হাজার বছরের পুরনো শিল্পরীতিকে। যে নাট্যরীতি আমাদের একেবারেই নিজস্ব, ছোটগল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের মতো পাশ্চাত্যের প্রেরণা তাড়িত বিষয় নয়। লঙ্গিনাসের 'অন সাবলাইম' আর পিটার ব্রুকের 'দ্য এম্পটি স্পেস'-এর মতো রচনাগুলোর সঙ্গে তিনি সমন্বয় করতে চাইলেন প্রাচ্যের নান্দনিকতার। ভারত নাট্যশাস্ত্রের নির্যাস ও বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সাহিত্যরীতি থেকে পাওয়া শিল্প উদ্দীপনাগুলো, এমনকি শব্দপ্রতিমাকে নতুন করে জাগিয়ে তুললেন নিজের সৃষ্টিকর্মে।

সেলিম আল দীনকে নতুন একটি শিল্পভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিল এই নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা। তিনি লিখলেন 'শকুন্তলা'। কিন্তু তাঁর মনে হল আরও বিরাট কোন জায়গায় নাটককে নিয়ে যাওয়া যায়। একদিকে হোমার, ওভিদ, ভার্জিল, দান্তে , অন্যদিকে বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসসহ ভারতীয় নন্দন শাস্ত্রকারদের রচনার মধ্য থেকে বের করতে চাইলেন মহাকাব্যিক বাস্তবতার মাত্রা। লেখা হল 'কেরামতমঙ্গল', 'কিত্তনখোলা' ও 'হাত হদাই'।

তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন কোনো পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এবং সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন শেষাবধি। 'মধ্য যুগের বাংলা নাট্য' নামের গবেষণাটি সম্পন্ন করার সময় তিনি কথানাট্য, পাঁচালি রীতির মতো শিল্প আঙ্গিকের চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি গবেষণাটি সম্পন্ন করার আগেই লিখে ফেললেন 'চাকা', 'যৈবতী কন্যার মন' ও 'হরগজ'। এ ছাড়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সেলিম আল দীনকে নতুন নাট্যধারার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। তিনি মনে করতেন, একজন লেখককে বাঁচায় তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যদর্শন, তাঁর নিজের এসথেটিক্স। যার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হয় দেশীয় ঐতিহ্যের শিল্পধারণা ও প্রেরণা।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কিছু বিষয় তাঁকে বিপর্যস্থ করে তুলেছিল। অস্থির ও কেন্দ্রচ্যুত করে তুলেছিল- এর চূড়ান্তে ছিল শ্যালিকার মেয়ে অন্বিতার লিউকোমিয়া ধরা পড়ার বিষয়টি। একমাত্র সন্তান মঈনুল হাসানের অকাল মৃত্যুর পর থেকে নিঃসন্তান সেলিম আল দীন শিশু অন্বিতাকে ভীষণ ভালবাসতেন। আর নিজের সেজভাই বোরহান উদ্দীনের মেয়ে কাজরীকে সন্তানের মমতায় বড় করেছেন। অন্বিতার ক্যান্সার হওয়াটাকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি তিনি। ডাক্তারের কাছে রোগটির কথা শুনে চিৎকার করে শিশুর মতো কেঁদে একটি কথাই বারবার বলেছিলেন, 'অন্বিতার মৃত্যু আমি কিছুতেই দেখতে পারব না। তার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।' তাঁর সেই ইচ্ছাই পূরণ হয়েছিল। অন্বিতার মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস আগেই মারা গেছেন সেলিম আল দীন।

নিজের গ্রন্থ প্রকাশ নিয়ে তিনি কোনো দিন ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁর কিছু ভক্ত আর কিছু শুভানুধ্যায়ী বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এছাড়া বাংলা একাডেমী তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশ করে।

বিভিন্ন উৎসব আয়োজন যা কিছু জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হত তাতাঁকে বাদ দিয়ে ভাবা যেত না। বিভিন্ন উৎসবের মূল বাণী ঠিক করে দেওয়া, অনুষ্ঠানের মেজাজ অনুযায়ী গান তৈরি করে দেওয়া সবই করতেন তিনি। গান লিখতেন আশির দশকের মাঝমাঝি সময় থেকে। নাটকের গান তো ছিলই। পাশাপাশি আরও অনেক গান লিখেছিলেন। তিনি গানকে বলতেন, কথাসুর। ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ছোট্ট একটা গানের দল। নাম দিয়েছিলেন, 'কহনকথা'।

সেলিম আল দীন প্রেরণা পেয়েছেন হোমার, ফেরদৌসী, গ্যেটে আর রবীন্দ্রনাথের মতো কবিদের কাছ থেকে। তাঁদের কাছ থেকে বারবার ফিরে গেছেন একান্ত বাধ্যগত শিষ্যের মতো। আবার তাঁদেরকে গুরু মেনে তাঁদেরকে পেরিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা দিনরাত মনের ভেতরে লালন করতেন তিনি। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন তাঁর সেই আশা কোন দিন পূরণ হওয়ার নয়। শেষদিকে লেখা তাঁর দিনপঞ্জির অসংখ্য পাতায় এর প্রমাণ আছে।

সেলিম আল দীন যেসব কাজ করেছেন সেগুলির মূলে আছে পাশ্চাত্য শিল্পধারাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজস্ব শিল্প সৃষ্টি করে তা অনুশীলন করা।

পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের লেখক, কবি, শিল্পী ও নাট্যকর্মীদের এই বোধে উজ্জীবিত করা যে আমাদের শিল্প ঐতিহ্য নিয়েই আমরা তৈরি করতে পারি আমাদের নিজস্ব শিল্পজগত। পরের অনুকরণ করে কখনও নিজস্বতা অর্জন করা যায় না। খুব জোরের সঙ্গে বারবার বলেছেন, 'অন্যের বসন কখনও নিজের হয় না। হয় না সেটা নিজের ভূষণ।'

তথ্যসূত্র: থিয়েটারওয়ালা, থিয়েটার, থিয়েটার স্টাডিস, ভোরের কাগজ, যুগান্তর , লেখকের স্ত্রী বেগমজাদী মেহেরুন্নেসা সেলিম ও তাঁর ছাত্র।

লেখক : শামীমা দোলা

গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প .....
তাঁদের অবদান,
বিভিন্ন সময়ের ....

দেশের গুণী ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী পড়ার জন্য ওয়েবসাইটটি দেখুন।

www.gunijan.org.bd

সম্পাদক : উর্মি লোহানী, প্রকাশক : গুণীজন ট্রাস্ট, মুদ্রণ : পাথওয়ে, অলংকরণ : আবু এহসানুল কবির হিমেল, যোগাযোগ : ৪/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক - বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েব : www.gunijan.org.bd, ফোন : +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০২৮১৪৬৫২৪৯৬-৭